আমার ব্র্যাক জীবন

লবন-গুড় স্যালাইন

আমার গবেষণা জীবনে এর প্রভাব

আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী

লবন-গুড় স্যালাইন: আমার গবেষণা জগতে এর প্রভাব

সূচিপত্র:

পাতা ৩ | উন্নয়নে ওটেপ একটি গেম চেঞ্জার

পাতা ৮ | আমার গবেষণা জীবনে ওটেপ এর প্রভাব

উন্নয়নে ওটেপ একটি গেম চেঞ্জার

শাল্লাতে প্রথম থেকেই গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে জোর দেওয়া হয়েছিল। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সূচকগুলো তখন বিশ্বের প্রায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে। শিশুমৃত্যু হার বা চাইল্ড মর্টালিটি রেট ছিল ২৫০-এর কোঠায়। এর অর্থ হলো বাংলাদেশি শিশুদের এক-চতুর্থাংশই তাদের পঞ্চম জন্ম দিবসের আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। একইভাবে মাতৃমৃত্যু হারও ছিল অত্যধিক, প্রায় ১ হাজারের কাছাকাছি। এই অবস্থার উন্নতিকল্পে ব্র্যাক প্রথমেই সিলেটের শাল্লা এলাকায় ৪টি ক্লিনিক চালু করে। মেডিকেল কলেজ থেকে সদ্য পাশ করা এমবিবিএস ডাক্তারদের ওপর এসব ক্লিনিকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছিল। কিন্তু তাদেরকে বেশিদিন সেই অজপাড়াগাঁওয়ে ধরে রাখা যায়নি। এই সংকট মোকাবিলায় ব্র্যাক সিদ্ধান্ত নেয় যে, এমবিবিএস ডাক্তারদের পরিবর্তে ডিপ্লোমা বা এ ধরনের স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দেবে। স্থানীয় এগারোজন যুবককে প্যারামেডিক হিসেবে প্রশিক্ষিত করে ক্লিনিকের বিভিন্ন দায়িত্বে বসানো হলো। কিন্তু এবার দেখা দিল নতুন আরেক সমস্যা। স্থানীয় হওয়ার কারণে এসব প্যারামেডিকরা খুদে ডাক্তার সেজে নিজেরাই ডাক্তারির পসরা সাজিয়ে বসল। ফলে ব্র্যাকের কর্মতৎপরতায় স্থবিরতা নেমে এল। এবারে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। প্যারামেডিকের বদলে স্বাস্থ্যসেবিকা নিয়োগ দেওয়া হবে। এরা মহিলা, নিম্ন আয়ধারী এবং স্বল্প শিক্ষিত। ব্র্যাকের উদ্ভাবিত এই স্বাস্থ্যসেবিকা কার্যক্রম এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রয়েছে। প্রশিক্ষিত ডাক্তার-নার্সদের অভাবে এরাই এখন পৃথিবীর দরিদ্রতম অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার হাল ধরে আছেন। এ বিষয়ে অন্যত্র বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

সত্তর দশকের প্রথম দিকে বছরে প্রায় আড়াই লাখ বাংলাদেশি ডায়রিয়াজনিত পানি শূন্যতায় মারা যেত, যার সিংহভাগই ছিল শিশু।

১৯৭৯ সাল। বছরটি ছিল আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। বাংলাদেশে শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে কী ধরনের কার্যক্রম নেওয়া যায়, তা বিবেচনার লক্ষ্যে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। বেশ কিছু সদস্যের সঙ্গে সেই কমিটিতে ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদও ছিলেন। তখনকার কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরির (বর্তমান আইসিডিডিআর'বি) হেনরি মোসলে এবং লিংকন চেনও একই কমিটিতে ছিলেন। একটি মিটিংয়ের ফাঁকে আবেদ ভাই রাষ্ট্রপতিকে বললেন যে, বাংলাদেশের সব শিশু যাতে রোগ নিরোধক টিকা

পায় তা নিশ্চিত করতে তিনি আগ্রহী এবং এই কাজে তিনি তাঁর সহায়তা কামনা করলেন। রাষ্ট্রপতি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আমাকে কয়েকটা বছর সময় দিন। টিকা কার্যক্রম ভালোভাবে চালাতে হলে একটি নিশ্ছিদ্র কোল্ড চেন দরকার, যা আমি এখনই নিশ্চিত করতে পারছি না। টিকাদান প্রচেষ্টা আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তেমন আর এগোয়নি। এদিকে আবেদভাই তার বন্ধু রকফেলার ফাউন্ডেশনের জন রোডীসহ কয়েকজনের সঙ্গে ব্র্যাকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে ঠিক হলো, ব্র্যাক একটি ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচি হাতে নেবে।

ডায়রিয়া একটি প্রাণহারী রোগ। সত্তর দশকের প্রথম দিকে বছরে প্রায় আড়াই লাখ বাংলাদেশি ডায়রিয়াজনিত পানি শূন্যতায় মারা যেত, যার সিংহভাগই ছিল শিশু। ডায়রিয়ার প্রকোপ পৃথিবীর সব অঞ্চলেই দেখা যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ডায়রিয়ার ফলে একসময় বাংলাদেশে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। ডায়রিয়া একটি সমষ্টি রোগের নাম। এর নানা রূপ আছে। তবে ভয়াল রূপ হলো কলেরা বা ওলাওঠা। কলেরা হলে খুব কম সময়ের মধ্যেই শরীর থেকে সমস্ত বা বেশিরভাগ তরল পদার্থ বেরিয়ে শরীরকে পানিশূন্য করে ফেলে। এর ফলে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কার্যত ডায়রিয়ার চিকিৎসা কিন্তু কোনো কঠিন কাজ নয়। রোগের কারণে যে পরিমাণ তরল পদার্থ শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তার সমপরিমাণ সঠিকভাবে পুনর্ভরন করাই হলো এর কার্যকর চিকিৎসা। তবে ডায়রিয়ায় তরল পদার্থের সঙ্গে মানবদেহ থেকে শুধুমাত্র যে পানিই বেরিয়ে যায় তা কিন্তু নয়। সঙ্গে শরীরের রোগ নিরাময়কারী অনেক উপাদানও বেরিয়ে যায়। যার অন্যতম হচ্ছে ইলেক্ট্রোলাইট। তাই চিকিৎসার সময় পানির সঙ্গে এসব উপাদানগুলো শরীরে দিতে হয়। মজার ব্যাপার হলো, এই উপাদানগুলো কিন্তু অতি সহজেই আমাদের বেশির ভাগ ঘরেই পাওয়া যায়। যেমন : খাবার লবণের মধ্যে রয়েছে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন যে, এই ইলেক্ট্রোলাইট সমৃদ্ধ পানীয় খেলেই এটা শরীরের মাঝে সহজেই মিশে যায় না। শরীরের মূল অন্ত্রে ঢুকতে হলে এগুলোকে আরেকটি মাধ্যমের সহায়তায় দেহে প্রবেশ করাতে হবে এবং এই মাধ্যমটি হলো গ্লুকোজ। আমরা জানি যে চিনি বা গুড় হলো গ্লুকোজের একটি রূপ। গুড়ের মধ্যে অবশ্য কিছু বাড়তি উপাদানও থাকে যেমন: পটাশিয়াম ও বাইকার্বনেট। যেহেতু ডায়রিয়া হলে পাতলা পায়খানার সঙ্গেসঙ্গে এই পটাশিয়াম এবং বাইকার্বনেটও বেরিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ডায়রিয়ার স্যালাইন বানানোতে চিনির চাইতে গুড় বেশী উপযোগী।

একসময় আবেদভাই শাল্লায় এসে প্রকল্প সভায় এই ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচির ব্যাপারে ব্র্যাককর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন। সকলকে খুব উচ্ছ্বসিত ও উদ্দীপ্ত মনে হলো। শাল্লাতেই ডায়রিয়া প্রকল্পের প্রথম পাইলট আয়োজন করা হবে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল, গ্রামের মানুষকে এ বার্তাটি কীভাবে দেওয়া হবে যে, ডায়রিয়ার জন্য খাবার স্যালাইন হচ্ছে একমাত্র কার্যকরী চিকিৎসা এবং সেই স্যালাইন ঘরেই বানানো

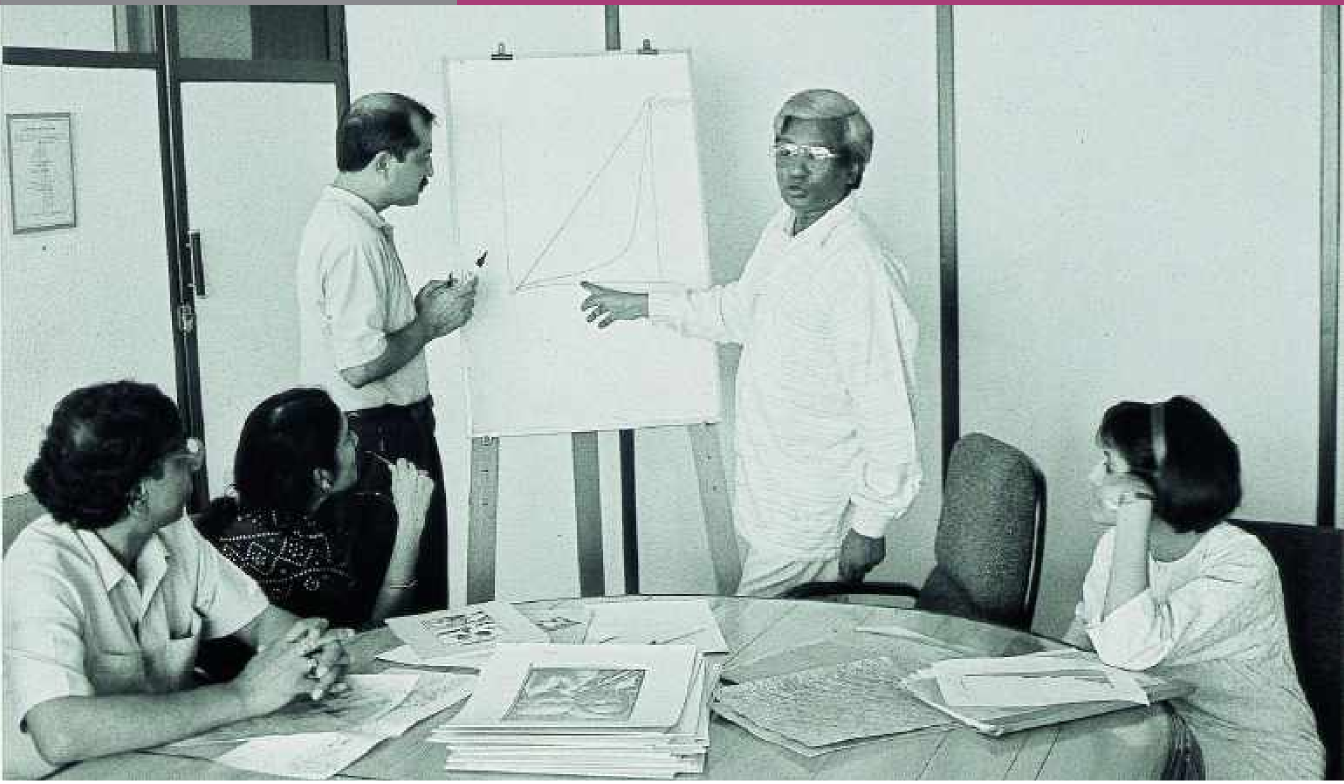

সম্ভব। জন রোডী এবং অন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গেল, পৃথিবীর অন্যত্রও এটা নিয়ে তখন গবেষণা চলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সবচাইতে নিরাপদ ব্যবস্থা হচ্ছে স্যালাইনের সব উপাদান একটি প্যাকেটের মধ্যে পুরে তা বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগীকে খাওয়ানো। প্যাকেটের সব উপাদান এক লিটার পানিতে ঢেলে তা ভালো করে নেড়ে প্রতিবার পাতলা পায়খানা হওয়ার পর খাওয়াতে হবে। কিন্তু সত্তর দশকের শেষের বাংলাদেশে এটিকে সম্ভাব্য বাস্তব পন্থা বলে মনে হয়নি। বিরাজমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। ডায়রিয়ার প্রকোপ যেখানে বেশি সেই গ্রামাঞ্চলে এটি কোনোভাবেই পৌঁছানো সরকার বা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তার ওপর রয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যয়। তখন বলা হতো যে, প্রতিটি ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে যদি দু প্যাকেট স্যালাইন ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা প্রজাতন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য বাজেট ছাড়িয়ে যাবে। একটা বিকল্প হিসেবে মনে হলো যদি মানুষকে ঘরে বসে এই স্যালাইন বানানোর কৌশল শেখানো যায় তাহলে কেমন হয়? কিন্তু বিপত্তি হলো কীভাবে লবণ, গুড় ও পানির পরিমাণ ঠিক করা হবে। ইন্দোনেশিয়ায় সে সময় একটি ডায়রিয়া চামচ উদ্ভাবিত হয়েছিল, যার ছিল দুটো প্রান্ত। এক প্রান্তে মাপা হবে লবণ আর অন্য প্রান্তে চিনি বা গুড়। জন রোডী এই চামচের একটি নমুনাও সঙ্গে করে ঢাকায় এনেছিলেন। নতুনত্বের কারণে এই উদ্ভাবনকে সকলেই সাধুবাদ দিলেন কিন্তু একটি কারণে খুব বেশি দূর এগোনো গেল না। আর তা হলো এর স্থায়িত্ব। যদি চামচটি হারিয়ে যায়

কিংবা ভেঙে যায় তাহলে কী হবে? বাদ পড়ে গেল এই উদ্ভাবন। আরও কিছু বিকল্প চিন্তা এল, কিন্তু এগুলোর গুণাগুণ বিচারে শেষ পর্যন্ত টিকে গেল একটি ফর্মুলা। আর তা হলো ‘এক চিমটি লবণ আর এক মুঠ গুড়‘। ব্র্যাকের পুরনো কর্মী সুখেন্দ্র কুমার সরকারের নেতৃত্বে শুরু হলো পাইলট প্রকল্প-শাল্লা, আজমিরীগঞ্জ আর বানিয়চং থানায়। এমন সময় সুদূর আমেরিকা থেকে টেড এলারব্রক নামে এক তরুণ ডাক্তার এসে যোগ দিলেন এই প্রকল্পে। তিনিই প্রধানত টেকনিক্যাল এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি দেখতেন এবং ঢাকাস্থ আইসিডিডিআরবি‘র সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পাইলট প্রকল্পের প্রধান দুটো লক্ষ্য ছিল। লবণ-গুড়ের ফর্মুলা মাঠপর্যায়ে নিখুঁতভাবে স্থানান্তরিত করা এবং ধীরে ধীরে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রত্যেক মা-কে এই ফর্মুলায় স্যালাইন বানানো শেখানো। কিছুসংখ্যক স্থানীয় উদ্যমী মহিলা যাদের বয়স ২০-২৫ বছরের মধ্যে ছিল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের বাড়ি বাড়ি পাঠানো হলো। এই নতুন কর্মীদের নাম দেওয়া হলো ওরাল রিপ্লেসমেন্ট ওয়ার্কার বা ওআরডব্লিউ। ‘মনে রাখার মত সাতটি পয়েন্ট‘-এর মাধ্যমে শুরু হলো শিক্ষা কার্যক্রম। এভাবে প্রায় ছয়মাস চলল এই পাইলট প্রকল্প। তখন কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে, ব্র্যাকের এই উদ্যোগ একসময় ব্র্যাক তথা বাংলাদেশের শিশুদের জন্য গেম চেঞ্জার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। কর্মসূচির নাম দেওয়া হলো ‘ওরাল থেরাপি প্রোগ্রাম‘ সংক্ষেপে ‘ওটেপ‘।

পাইলট পরবর্তী এক দশক ধরে ব্র্যাকের হাজার হাজার কর্মী বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে মায়েদেরকে লবণ-গুড় দিয়ে নিখুঁতভাবে কীভাবে স্যালাইন বানাতে হয় এবং ডায়রিয়া হলে কীভাবে তা খাওয়াতে হয় সেটা শিখিয়েছেন। কর্মসূচি চলাকালে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা প্রসূত নানা উদ্ভাবনী যোগ করে একে পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । বলতে দ্বিধা নেই যে, ব্র্যাকের এই যুগান্তকারী কাজের ফলে বাংলাদেশে ওয়াটারী ডায়রিয়ায় মৃত্যুহার আজ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। আর মুখে খাওয়ার স্যালাইনের ব্যবহার তো পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রায় পঁচাশি ভাগ ডায়রিয়া রোগী এখন এই স্যালাইন ব্যবহার করছে। ব্র্যাকের এই সাফল্য বক্ষে ধারণ করে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

উন্নয়ন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ‘ওটেপ‘ একটি নতুন ব্যবস্থাপনা এবং নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। একটি হলো অবলোকন বা

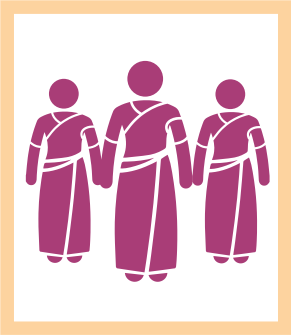

কিছুসংখ্যক স্থানীয় উদ্যমী মহিলা যাদের বয়স ২০-২৫ বছরের মধ্যে ছিল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের বাড়ি বাড়ি পাঠানো হলো। এই নতুন কর্মীদের নাম দেওয়া হলো ওরাল রিপ্লেসমেন্ট ওয়ার্কার বা ওআরডব্লিউ।

মনিটরিং। ওআরডব্লিউরা কীভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন, তা মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন করে তাদের বেতন-ভাতা ঠিক করা হতো। শেখানোর এক মাস পর একজন মনিটরকে পাঠান হতো সেই মায়েদের সঙ্গে কথা বলতে। মায়েরা যদি ঠিক মতো শিখে থাকেন তবেই কর্মীরা পূর্ণ বেতন পেতেন।

দীর্ঘ ১০ বছর ধরে যারা এই প্রকল্পের বিভিন্ন স্তরে কাজ করেছেন যথা মাঠপর্যায়, ব্যবস্থাপনা, তাত্ত্বিক ক্ষেত্র, অবলোকন ও গবেষণা, তাদের সকলের প্রতি আমি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। একইসঙ্গে ব্র্যাকের বাইরেও যারা এই কাজে অবিরাম সহায়তা প্রদান করেছিলেন, যেমন: আইসিডিডিআর'বি এবং ব্যক্তিগতভাবে টেড এলারব্রক, রিচার্ড ক্যাশ, জন রোডী, লিংকন চেন, প্যাট্রিক ভোন, এম এ ওয়াহিদ, ইমিতা করনাজ প্রমুখ, তাদের সকলের প্রতি রইল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা।

সুখেন্দ্র কুমার সরকার ছিলেন ব্র্যাকের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। তিনি ছিলেন 'ওটেপ'-এর মূল ব্যবস্থাপক, বলা যায় খুঁটি। তখনকার কার্যক্রমের ওপর একটি বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, যার নাম 'একটি উজ্জ্বল অধ্যায়'। উন্নয়ন সংক্রান্ত লেখালেখিতে সুখেনদা'র এই বইটি একটা সুখপাঠ্য ইতিহাস। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৯৬ সালে আমি ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড ক্যাশ যৌথভাবে `A Simple Solution: Teaching Millions to Treat Diarrhoea at Home' নামে যে পুস্তক প্রকাশ করেছিলাম, তাতে ওটেপসহ সে সময়ের ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ বিধৃত রয়েছে।

আমার গবেষণা জীবনে ওটেপ এর প্রভাব

আশির দশকের ডায়রিয়া সংক্রান্ত এই কাজটি আমার নিজের পেশাগত জীবনে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। আমরা এর মাধ্যমেই ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগকে (যার আদুরে নাম আরইডি) নিবিড় গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে ব্র্যাকের কোনো কর্মসূচিকে প্রথমবারের মতো এক নতুন শিখরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম। উন্নয়নে গবেষণার ভূমিকা নিয়ে অনেকদিন থেকেই নানা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে। অনেকের ধারণা গবেষণা হলো এক ধরনের বিলাসিতা, এর প্রায়োগিক সম্ভাবনা খুবই সীমিত। ব্র্যাকে আরইডি-র মূলমন্ত্র ছিল যে, গবেষণার মাধ্যমে কার্যক্রমের গুণগত মানোন্নয়ন করে তাকে মানবগোষ্ঠীর উন্নয়নের কাজে লাগানো। কোনো গবেষণা যদি ঈপ্সিত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়, তাহলে সেই গবেষণার কোনো প্রয়োজন নেই। ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচি আরইডি-র জন্য এক মহা সুযোগ বয়ে এনেছিল, যার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা আমরা করেছিলাম। বস্তুত এটি ছিল আমাদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা বা চ্যালেঞ্জ, আরইডি কি সত্যিকার অর্থে ব্র্যাকের এই কর্মসূচিতে কোনো অবদান রাখতে পারবে?

আমরা অনুধাবন করেছিলাম যে, আরইডি যদি ডায়রিয়া কর্মসূচিকে ফলপ্রসূ সহায়তা দিতে চায় তাহলে গবেষকদের অবশ্যই কর্মসূচির খুব কাছাকাছি অবস্থান করে কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু এর সঙ্গে যে ঝুঁকিও ছিল তা উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। প্রথমত কর্মসূচির কর্মীরা গবেষকদের কী দৃষ্টিতে দেখবে, নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশ হিসেবে নাকি সহকর্মী বন্ধু হিসেবে? দ্বিতীয়ত বেশি কাছাকাছি কাজ করলে গবেষণার স্বাতন্ত্র্য, বস্তুনিষ্ঠতা বা নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশংকা ছিল। এ দুটো ঝুঁকি নূন্যতম পর্যায়ে রাখতে আমাদের বিশেষ যত্নবান হতে হয়েছিল।

কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে তাদের সভাগুলোতে নিয়মিত উপস্থিতি এবং মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন বাড়াতে আমরা বিশেষভাবে তৎপর হই। মাঠপর্যায়ে সফরের পর আমরা কর্মসূচি বরাবর একটা চিঠি দিতাম, যেখানে আমাদের পর্যবেক্ষণগুলো লিপিবদ্ধ করতাম এবং চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ থাকলে সেগুলো কীভাবে মোকাবিলা বা জয় করা যায়, তা আলোচনা করতাম। অবশ্য আনুষ্ঠানিক চিঠি দেওয়ার আগে চিঠির বিষয়বস্তুগুলো আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতাম, যাতে চিঠি কোনো বিস্ময়ের সৃষ্টি না করে। এই চিঠির কপি স্বয়ং আবেদ ভাইকেও দেওয়া হতো, যাতে করে ব্র্যাকের সর্বোচ্চ পর্যায় আরইডি-র কাজ সম্পর্কে অবহিত থাকে। বলা বাহুল্য, এই কাজে আবেদ ভাইয়ের অনবদ্য সমর্থন এক বিরাট নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল।

ওটেপ-এর সঙ্গে আমরা বেশ একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। অবশ্য এটা এত সহজে আসেনি। প্রথম দিকে আরইডি-র গবেষকদের কাজকে সন্দেহের চোখে, কখনওবা তাচ্ছিল্য ভরে দেখা হতো। ১৯৮০ সালের কোনো এক সময়ের কথা মনে পড়ছে। সিলেটের মৌলভীবাজারে ব্র্যাক ওটেপ অফিসে আমরা কয়েকজন গবেষক রাত কাটিয়েছিলাম। সে সময় প্রধান কার্যালয় থেকে আসা একজন অডিটরও একই অফিসে অবস্থান করছিলেন। রাতে থাকার জন্য সবচাইতে ভাল জায়গাটি দেওয়া হয় অডিটরকে আর রান্নাঘরের পাশে একটি রুমে আমার জায়গা হয়। যদিও জ্যেষ্ঠতার নিরিখে ব্র্যাকে আমার অবস্থান ছিল অগ্রগণ্য। তবুও আমি এটিকে কোনো গুরুত্ব দিইনি বা এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলিনি। কিন্তু আমার সহকর্মী জালাল (জালালউদ্দীন আহমেদ, অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক-ব্র্যাক) বিষয়টিকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। এটি তাকে ভীষণভাবে আহত করেছিল। তাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম, এটি একটি ছোট ব্যাপার। এতে মনক্ষুণ্ন হওয়ার কিছুই নেই। আমরা তখন পর্যন্ত সর্বস্তরের ওটেপ কর্মীদের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠিনি। তাই হয়তো এ ধরনের বিরূপ আচরণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাকে বলেছিলাম যে, কর্মক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

জালাল আরইডি-তে যোগদান করে ১৯৮০ সালে। তার আগে সে বিআইডিএস-এ কাজ করত। আরইডি-র প্রথম দিকে, বিশেষ করে ওটেপ-এর মূল্যায়ন কাজে তার অনেক অবদান। শিশুমৃত্যুর ওপর ওটেপ-এর প্রভাব নির্ণয়ের ভার আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। আইসিডিডিআর'বি এবং আরও কিছু সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আমরা একটি গবেষণা রূপরেখা বা ডিজাইন তৈরি করে তা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে শুরু করি। বাংলাদেশের মোট আটটি থানায় ছিল এ কাজের বিস্তৃতি। শুরু হয় হবিগঞ্জ জেলার বাহুবলের মিরপুর ইউনিয়ন দিয়ে। জালাল, আমি এবং গবেষণা দলের আরও প্রায় ১০/১২ জন সদস্য গেলাম মিরপুর। স্থানীয়ভাবে থাকার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় আমরা উঠলাম একটি স্কুলে। দরজা জানালা রয়েছে এমন একটি রুমে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করলাম। আর পুরুষরা উঠলাম আরেকটি রুমে, যার দরজা ছিল ঠিকই কিন্তু

জানালাগুলো ছিল ভাঙ্গা। মাঝরাতে হঠাৎ ঝড় এলো। গবেষণা কাজের সব কাগজপত্র (যেমন প্রশ্নপত্র) মেয়েদের রুমে থাকার কারণে রক্ষে। পুরুষদের অবস্থা ছিল হযবরল। ব্যক্তিগত অনেক কিছুই সেদিন ঝড়ে উড়ে গিয়েছিল। এভাবেই যাত্রা শুরু করেছিল ওটেপ-এর গবেষণা কাজ। আর এতে এক দ্বীপ্তিময় অবদান ছিল জালালের।

ওটেপ-এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল খুবই কলেজিয়েল। এর পেছনে বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল সুখেন দা'র। তিনি আরইডি-র একনিষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন এবং আমাদের করা সুপারিশসমূহ অতি যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করতেন। আমার ব্র্যাক জীবনে তার সঙ্গে কাজ করা ছিল এক সুখকর অধ্যায়। আমরা যেসব সুপারিশ করতাম সেগুলো ছিল কঠিন উপাত্তভিত্তিক। গবেষণাতে আমরা সবসময় বস্তুনিষ্ঠ ছিলাম, এ ব্যাপারে আমরা কখনই আপস করিনি। আমাদের এই অনুসৃত নীতি সম্পর্কে ওটেপ-এর কর্মকর্তারা ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে তাদের খুব কমই সন্দেহ বা প্রশ্ন থাকত।

পাইলট পর্যায় থেকে যাত্রা শুরু করে দেশের সর্বশেষ মা-কে স্যালাইন বানানো শেখানো পর্যন্ত দশ বছরে বিস্তর গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। এর অনেকগুলোই দেশি-বিদেশী গবেষণা সাময়িকীতে স্থান পেয়েছে।

ইদানীং আরইডি-র কাজ নিয়ে নানা দেশের উন্নয়ন গবেষকরা বেশ বলাবলি করছেন, আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাদের আগ্রহ কীভাবে আরইডি-র গবেষণা ওটেপকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্য এবং প্রভাব বা ইমপ্যাক্ট অর্জনে এত সহায়তা করেছিল। ওটেপ-এর ওপর আরইডি-র কার্যক্রম একটি বা দুটি গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। পাইলট পর্যায় থেকে যাত্রা শুরু করে দেশের সর্বশেষ মা-কে স্যালাইন বানানো শেখানো পর্যন্ত দশ বছরে বিস্তর গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। এর অনেকগুলোই দেশি-বিদেশী গবেষণা সাময়িকীতে স্থান পেয়েছে। পাইলট পর্যায় অতিক্রম করে যখন ওটেপ দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করল, তখন আরও অধিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে দেখা যায় যে সাধারণত পাইলট পর্যায়ে অনেক যত্ন সহকারে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কাজ করা হয়। কিন্তু একটি কর্মযজ্ঞ যখন পাইলট পর্যায় পেরিয়ে নতুন নতুন অঞ্চলে প্রসারিত হতে থাকে তখন ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আর তাই গবেষণার প্রয়োজনও সেখানে বেশি অনুভূত হয়।

পাইলট পর্যায়ে লবণ-গুড় ফর্মুলা ছিল 'এক চিমটি লবণ আর দুই স্কুপ গুড়'। আইসিডিডিআরবি'তে স্যালাইনের নমুনা পরীক্ষায় দেখা গেল যে, কোনো একটি এলাকার নমুনাতে লবণের পরিমাণ

খুব বেশি পাওয়া যাচ্ছে। সঙ্গেসঙ্গে অনুসন্ধানে বের হলো যে, এই এলাকায় মায়েরা সঠিক শিক্ষার অভাবে স্যালাইনের ফর্মুলা উল্টে ফেলেছেন। অর্থাৎ এক চিমটি লবণের পরিবর্তে দুই চিমটি লবণ আর দুই স্কুপ গুড়ের পরিবর্তে এক স্কুপ গুড় দিয়ে স্যালাইন বানিয়েছেন। ১+২ এর পরিবর্তে ২+১ ফর্মুলাতে লবণ ও গুড় মিশিয়েছেন। গবেষণা করে বের করা হলো যে, দুই স্কুপের পরিবর্তে যদি এক মুঠ গুড় দেওয়া হয় তাহলে গুড়ের পরিমাণ ঠিকই থাকে। এরপর থেকে ১+১ ফর্মুলাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই সংশোধনের ফলে মায়েদের ভুল করার সম্ভাবনা চিরতরে দূর হয়েছিল।

অপর একটি গবেষণা থেকে জানা গেল যে, সময়ের সঙ্গেসঙ্গে মায়েরা স্যালাইন বানানোর কায়দা কিছুটা ভুলে যাচ্ছিলেন। তখন ওটেপ নতুন করে রেডিও-র মাধ্যমে প্রচার বাড়িয়ে দেয়। দেখা গেল ফলশ্রুতিতে কিছুদিনের মধ্যেই মায়েদের স্যালাইন বানানোর দক্ষতা আবার বেড়ে যাচ্ছে।

ওটেপ-এর প্রথম দিকে একাধিক গবেষণার ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে যদিও বাংলাদেশের মায়েরা সঠিকভাবে স্যালাইন তৈরি করতে পারেন, কিন্তু স্যালাইন ব্যবহারের হার নিতান্তই অপ্রতুল, শতকরা দশ ভাগেরও কম। ব্র্যাকের জন্য এটা ছিল একটি হতাশাব্যঞ্জক খবর। আমাদের ধারণা ছিল যে, যদি মায়েদের স্যালাইন বানানো শেখানো যায় তাহলে তারা নিজেরাই নির্বিঘ্নে তা ব্যবহার করবে। এবার সত্য উদ্ঘাটনে আরইডি ঝাঁপিয়ে পড়ল। জানতে হবে, কেন মায়েরা স্যালাইন ব্যবহার করছে না। একে একে অনেক কারণই বেরিয়ে এল, যা ওটেপ তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করল। আস্তে আস্তে স্যালাইন ব্যবহারের হারও বাড়তে লাগল।

ঠিক হলো যে স্যালাইন ব্যবহারের হার বাড়ছে কিনা তা মনিটর করতে হবে এবং এজন্য প্রতি এলাকাতে নিয়মিত ইউসেজ সার্ভে শুরু করা হবে। এটার ভার পড়েছিল আরইডি-র ওপর। এ কাজের জন্য প্রায় ১শ মাঠ গবেষক নিয়োগ দেওয়া হয়, যার নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় আরেক তরুণ উদ্যোমী গবেষক কামরুন নুর ফারুককে। কয়েকটি টিমে বিভক্ত হয়ে এই ইউসেজ সার্ভে পরিচালিত হয়েছিল। এখানে ৩০ ক্লাস্টার সার্ভে নামে সহজ, সাশ্রয়ী ও দ্রুত এক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছিল। এই ইউসেজ সার্ভে ওটেপ-এর ব্যবহার হার বাড়াতে বেশ বড়সড় অবদান রেখেছিল। মনে পড়ে, তখন কিছু অতি উৎসাহী কর্মীর জন্য আরইডি এবং ওটেপ-এর মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। যশোর এলাকায় ইউসেজ সার্ভে চলছে। সম্ভবত ব্যবহারের সংখ্যা কম পেয়ে মাঠ গবেষকদের কয়েকজন ওটেপ অফিস গিয়ে নিজেদের কাজের কথা জাহির করে বলেছিল যে, সেই এলাকায় স্যালাইন ব্যবহারের হার ঋণাত্মক! এরপর ইউসেজ সার্ভে কর্মীদের নতুন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

মাঠপর্যায়ে সফরের সময় মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী নীলোফারকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম। ব্র্যাক ওটেপ-এর কাজে আমি এতই পুলকিত এবং গর্বিত ছিলাম যে, আমি চাইতাম অন্তত আমার কাছের আপনজন এটা সম্পর্কে জানুক এবং উপলব্ধি করুক যে, আমরা অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছি। মনে আছে, ওটেপ-এর মাঠ কর্মীরা এক মা-কে লবণ গুড়ের স্যালাইন সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছিল। নীলোফার খুব মনোযোগের সঙ্গে সেটা শুনছিল এবং মায়ের সঙ্গে কর্মীর যোগাযোগ তথা কথাবার্তা ও আকার ইঙ্গিতে মতবিনিময় দেখছিল। এলাকা থেকে ফেরার পথে সে সুখেন দা'কে বলল, দাদা, আমার মনে হয় আপনাদের কর্মীরা বেশ ক্লান্ত এবং এর ফলে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা অনেকটা দায়সারা গোছের কাজ করছে। মনে হচ্ছিল যে, তারা যেন তোতা পাখির মতো এক মনে কথা বলে যাচ্ছিল আর মায়েরা শুধু শুনেই যাচ্ছিল। তাদের চেহারায় কোনো অভিব্যক্তি ছিল না। নিরুত্তাপ ও ভাবলেশহীন কথোপকথন। মনে হলো নীলোফারের এই পর্যবেক্ষণ সুখেন দা'র খুব পছন্দ হলো। সন্ধ্যায় ছিল প্রকল্প সভা। সুখেন দা সেখানে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে বললেন, বাইরে থেকে এসে আমাদের এক ভাবী অতি সত্য একটি দুর্বল দিক দেখিয়ে দিয়েছেন। অথচ আমরা যারা দিনরাত এই কাজে মগ্ন রয়েছি, বিষয়টি তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। যেমন কথা তেমন কাজ। কীভাবে এই শিক্ষা কার্যক্রম আরও বেশি সক্রিয় ও ইন্টারেকটিভ করা যায়, সেজন্য নতুনভাবে কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলো।

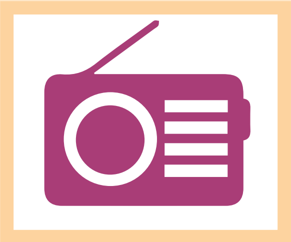

সময়ের সাথে সাথে মায়েরা স্যালাইন বানানো কিছুটা ভুলে যাচ্ছিলেন। তখন ওটেপ নতুন করে রেডিও'র মাধ্যমে প্রচার বাড়িয়ে দেয়। দেখা গেলো কিছু দিনের মধ্যেই মায়েদের স্যালাইন বানানোর দক্ষতা আবার বেড়ে গেলো।

মনে পড়ছে, তখন পাইলট প্রকল্পের প্রথম পর্যায়। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাস। কনকনে শীতে বেশ ভোওে শায়েস্তাগঞ্জে ট্রেন থেকে নেমে বেবীট্যাক্সি চেপে গেলাম হবিগঞ্জ। সেখান থেকে বানিয়াচং। তখন রাস্তাঘাট ছিল খুবই অনুন্নত। মাত্র কয়েক মাইল পথ যেতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে গেল। বানিয়াচংয়ে নেমে বাকি পথ হাঁটা। জানতাম ওটেপ-এর কর্মীরা কোনো গ্রামে আছে। জিজ্ঞেস করে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলাম। তখন বেলা দশটার মতো বাজে। ক্লান্ত দেহে ভাবলাম একটু বিশ্রাম নেই। পাওয়া গেল একটি টি স্টল। রাস্তার পাশেই বসে পড়লাম। চা খেতে খেতে দোকানী এবং আগত আরও কিছু খদ্দেরের সঙ্গে কথা জুড়লাম। এবারকার ফসল কেমন, হাওরে শীত কেমন পড়েছে ইত্যাদি। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এখানে একদল মহিলা ব্র্যাক নামক এক সংস্থা থেকে কাজ করছেন (তখন ব্র্যাকের তেমন পরিচিতি ছিল না)। আপনারা কী জানেন তারা কোথায়? বেশিরভাগের অভিব্যক্তি থেকে বোঝা গেল যে তারা জানে না। একটু দূরে বসা এক অল্প বয়সি লোক বলল, আপনি ওই মহিলাদের কথা বলছেন যারা (পরিবার) পরিকল্পনার কথা মহিলাদের বোঝাচ্ছে? তারা এই গ্রামেই থাকে কিন্তু তাদেরকে এখন পাওয়া কঠিন। কারণ তারা এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি ঘুরে পরিকল্পনার কথা বলছে। রাতে তারা 'অমুকের' বাড়িতে থাকে। সেখানেই তাদের দেখা পেতে পারেন। আমার কাজ হয়ে গেল। এই কথোপকথন থেকে দুটি বিষয় আমার উপলব্ধিতে এল। এক. গ্রামের বৃহত্তর জনগণ তথা পুরুষ সমাজ ওটেপ-এর কর্মী বা কাজ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। দুই. স্যালাইনের কাজকে কিছু লোক পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলছে। শেষোক্তটার একটা ঋণাত্মক প্রভাব বা তাৎপর্য রয়েছে, যা ভেবে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। সত্তরের দশকের শেষদিকে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তখনও সাধারণ মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা তেমন ছিল না। এ সময় গ্রামাঞ্চলে মহিলা কর্মী বলতে শুধু পরিবার পরিকল্পনার কাজে নিয়োজিত কর্মীরাই ছিলেন। যদি গ্রামের মানুষের মাঝে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্ম নেয় যে, ওটেপ-এর কর্মীরা আসলে পরিবার পরিকল্পনার হয়ে কাজ করছেন, তাহলে স্যালাইন বানানো শেখানোর কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হবে। জনসাধারণ এ কর্মীদের তখন সহজে গ্রহণ করবে না এবং স্যালাইনের ব্যবহার প্রচলনের সকল উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। টি স্টলের ছোট সভা শেষ করে গন্তব্যের দিকে যেতে যেতে এ কথাই ভাবছিলাম। চিন্তা করলাম, বিষয়টি আরও খতিয়ে দেখা দরকার। আমার তিনদিনের মাঠ সফরে এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও কিছু জানা গেল। ওটেপ-এর কর্মীদের সঙ্গেও এই নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হলো। এই ছোট 'গবেষণা' থেকে আমি

বাংলাদেশ পুরুষ শাসিত সমাজ। এখানে মহিলাদের যেকোনো নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা বা না করা অনেকটাই নির্ভর করে পুরুষের মনোভাব ও মতামতের ওপর।

এই উপসংহারে উপনীত হয়েছিলাম যে, ওটেপ কার্যপদ্ধতি তখন যেভাবে চলছিল তা থেকে এই ভুল ধারণার জন্ম হচ্ছিল। অর্থাৎ ওটেপ-এর সব কর্মীই মহিলা এবং গ্রামে তারা যাদের সঙ্গে কথা বলে অথবা যাদেরকে তারা স্যালাইন বানানো শেখায় তারা সকলেই মহিলা। পুরুষদের এখানে বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই। দূর থেকে পুরুষরা বুঝতে পারে না ওটেপ-এর কর্মীরা কী শেখাচ্ছে? তাই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা গুজব ছড়াচ্ছিল যে, এটি ‘পরিবার পরিকল্পনা‘ কার্যক্রম। বাংলাদেশ পুরুষ শাসিত সমাজ। এখানে মহিলাদের যেকোনো নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা বা না করা অনেকটাই নির্ভর করে পুরুষের মনোভাব ও মতামতের ওপর।

বানিয়াচং থেকে সরাসরি চলে গেলাম মার্কুলি গ্রামে। যেটি ছিল ব্র্যাকের শাল্লা প্রকল্পের প্রাণকেন্দ্র। সেখানে সুখেন দা এবং রবভাইসহ (মুশফিকর রব চৌধুরী, ব্র্যাকের অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা) অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হলো। সকলেই একমত হলেন যে, ওটেপ-এ পুরুষদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। ঢাকায় ফিরে বেশকিছু সুপারিশসহ একটি লম্বা চিঠি পাঠালাম। ঠিক হলো ওটেপ-এর প্রতিটি টিমে পুরুষ কর্মীদের সংখ্যা বাড়ানো হবে, যাদের কাজ হবে পুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্যালাইন সম্পর্কে জ্ঞান দান করা এবং মহিলা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে কী করছেন তা জানিয়ে সন্দেহ, ভুল ধারণা ও গুজব নিরসন করা। ব্র্যাকের পুরুষকর্মীরা স্কুল, মসজিদ, মন্দির, বাজারসহ সব পুরুষ-প্রধান প্রতিষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে এই কাজটি করেছিলেন। এমনকি শুক্রবারে জুম্মার নামাজে খুতবার পূর্বে ইমাম সাহেবের অনুমতি নিয়ে ব্র্যাককর্মীরা মুসল্লীদেরকে স্যালাইন সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন।

১৯৮৩ সালে আমি লন্ডনে পাড়ি জমাই। উদ্দেশ্য আরও উচ্চতর পড়াশোনা। এর আগের বছর আইসিডিডিআর‘বি মূল্যায়ন গবেষণার ওপর একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল, যেখানে ওটেপ-এর মূল্যায়নের ওপর কাজ করার সুবাদে আমাকে একজন জুনিয়র ফ্যাকাল্টি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কর্মশালার প্রধান সঞ্চালক ছিলেন লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের স্বনামধন্য অধ্যাপক প্যাট্রিক ভোন। তিনি আমাকে তার অধীনে ডক্টরেট করার আহ্বান জানালেন। একই সময়ে অধ্যাপক ডেভিড বেলও একই ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন হার্ভার্ডে ডক্টরেট করার জন্য। বিষয়টি নিয়ে পারিবারিক পর্যায় এবং আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আবেদ ভাই বললেন, তোমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসতে হবে। হার্ভার্ড বা আমেরিকায় পিএইচডি করতে ৪ থেকে ৫ বছর লেগে যায়। খাটাখাটুনি করলে লন্ডনে আরও কম সময়েই ডিগ্রি শেষ করা সম্ভব। আলোচনান্তে ঠিক হলো যে লন্ডনেই যাব। মনে পড়ে, আমার পিএইচডি করতে সময় লেগেছিল দু‘বছর তিন মাস। যা লন্ডন ইউনিভার্সিটির জন্য একটি রেকর্ড!

লন্ডনে যাওয়ার আগেই আমি ঠিক করে রেখেছিলাম যে, আমার পিএইচডি হবে ওটেপ-এর ওপর। স্যালাইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কেন মানুষ তা ব্যবহার করতে দ্বিধান্বিত হয়, এটিই ছিল আমার থিসিস বা অভিসম্পাতের মূল প্রতিপাদ্য। লন্ডনে এই গবেষণার তাত্ত্বিক দিক নির্দিষ্ট হয়ে গেলে মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি দেশে ফিরে আসি। গবেষণা পদ্ধতি ছিল কোয়ালিটেটিভ ও কোয়ান্টিটেটিভ পন্থার সমন্বয় ঘটিয়ে যাকে বলা হয় মিক্সড মেথড। প্রথমেই ঠিক করলাম কোয়ালিটেটিভ অংশটুকু শেষ করে নেব। ঠিক হলো ওটেপ-এর মিজান ভাইয়ের (মিজানুর রহমান চৌধুরী, ব্র্যাকের অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা) সহায়তায় তার নিজের গ্রাম আজমনগর এবং তার পার্শ্ববর্তী মজিদপুর গ্রামে এই গবেষণা চালানো হবে। দুটো গ্রামই কুমিল্লার দাউদকান্দি থানায় অবস্থিত। দুটি গ্রামে পুরো দু'মাস কাটিয়েছিলাম। আমি বড় হয়েছি শহরে। তবে একটানা দু'মাস গ্রামে অবস্থান করে সেখানকার জনগোষ্ঠী ও জীবনপ্রণালী সম্পর্কে জানার দুর্লভ সুযোগ হয়েছিল। আমার পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে অর্জিত এই অভিজ্ঞতার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

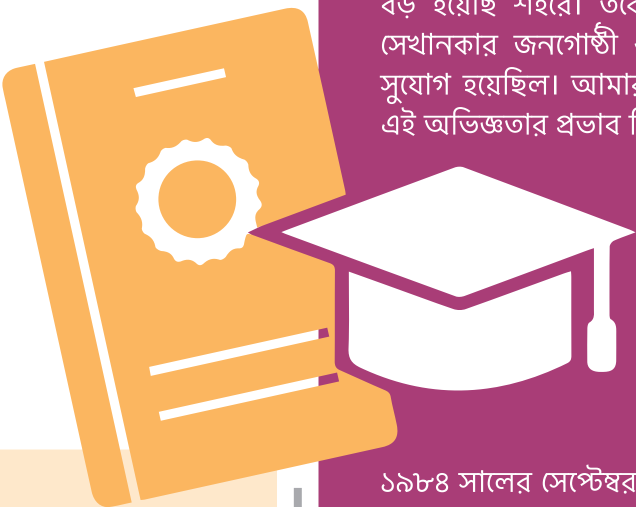

১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দুই তারিখ বিকেলের দিকে হঠাৎ শুনলাম দু'জন লোক আমার খোঁজে এসেছেন। ওদের কাছ থেকে একটি চিরকুট পেয়ে তা পড়ে মনে হলো আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে! লেখক আমার ভাই। তিনি তখন নারায়ণগঞ্জের ডেপুটি কমিশনার। আগত দুজন তার অধীনস্ত কর্মচারী। ভাই লিখেছেন, সেদিন ভোরেই আমাদের বাবা সিলেটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ভাইয়েরা সরাসরি সিলেট চলে যাচ্ছেন। ভাবলাম, কী করব? মজিদপুর যদিও সদর রাস্তা থেকে খুব দূরে নয়, কিন্তু বন্যার কারণে যেতে দু'ঘণ্টার মতো সময় লাগে। সেখানে অবস্থানকারী আমার গবেষক সহকর্মীদের সহমর্মিতায় সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হলাম। সন্ধ্যার একটু পরে ঢাকা পৌঁছে নাইট কোচে সিলেট পৌঁছলাম। কিন্তু পৌঁছে বাবাকে আর দেখা হয়নি। তাঁকে আমার অর্জিত ডিগ্রিটাও উপহার দিতে পারলাম না। এই মনোকষ্ট আমাকে পীড়া দেয়।

স্যালাইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কেন মানুষ তা ব্যবহার করতে দ্বিধান্বিত হয়, এটিই ছিল আমার থিসিস বা অভিসম্পাতের মূল প্রতিপাদ্য।

আগেই বলেছি আজমনগর ও মজিদপুর ছিল আমার গবেষণার এলাকা। মজিদপুরে থাকার জন্য একটি পরিত্যক্ত বাড়ি পেয়ে আমরা সকলেই ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। সমস্যা হলো আজমনগরে। গ্রামটি অত বড় নয়। একটা বাড়ির সামনের ঘরে একটু জায়গা পাওয়া গেল। ঘরের দুই ভাগের একটিতে আমার থাকার ব্যবস্থা। অন্যটি গরুর গোয়াল। এটিই বোধকরি মাঠ গবেষণার আসল রূপ ও দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

যাহোক দু'মাস অনেক খাটাখাটুনির পর নিবিড় গবেষণার ফলাফল দেখে বেশ পুলক অনুভব করেছিলাম। ভীষণ উৎফুল্ল লাগছিল। একটি ফলাফল যা ওটেপ-এর ওপর বিশাল প্রভাব ফেলেছিল, সেই কাহিনী এখন বর্ণনা করব। যারা রোগ নিয়ে কাজ করেন, তারা জানেন যে ডায়রিয়া এমন একটি রোগ, যার লক্ষণ হলো পাতলা পায়খানা। কিন্তু গ্রামে গিয়ে দেখলাম যে, পাতলা পায়খানা বলতে সাধারণ মানুষ চার ধরনের রোগকে বোঝায়। তারা মনে করে আপাত দৃষ্টিতে যদিও প্রতিটির লক্ষণ অভিন্ন (পাতলা পায়খানা) কিন্তু প্রতিটির আলাদা আলাদা কারণ বা ইটিওলজি রয়েছে। যেমন: দুধহাগা হলো এক ধরনের পাতলা পায়খানা। এই রোগ শিশুদের হয়। যদি কোনো কারণে মায়ের বুকের দুধ 'দূষিত' হয়ে যায়, সেই দুধ খেলে শিশুর দুধহাগা হবে। জানতে পারলাম, এই রোগ সারানোর জন্য অদ্ভুত সব চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে। একটি পদ্ধতি হলো গ্রাম্য ডাক্তাররা বুকের দুধ কয়েক ফোঁটা সিরিঞ্জে নিয়ে আবার মায়ের হাতে পুঁতে দেয়। স্থানীয় বিশ্বাস হলো যে, এর মাধ্যমে মায়ের দূষিত দুধ বিশুদ্ধ হয়ে যায়। ডায়রিয়ার মতো দেখতে অন্য রোগ হলা অজীর্ণ, আমাশয় ও ডায়রিয়া। অজীর্ণের কারণ হলো পচা-বাসি খাবার। আমাশয়ের লক্ষণের মধ্যে রয়েছে পিচ্ছিল মিউকাস। চতুর্থ রোগ যাকে স্থানীয় মানুষরা বলে ডায়রিয়া, তা হলো তীব্র বা প্রবলবেগে বের হওয়া পাতলা পায়খানা, যাকে কেউ কেউ বলে কলেরা। এই নতুন জ্ঞান আমি পরবর্তী সময়ে দেশজুড়ে কোয়ানটিটেটিভ জরিপে ব্যবহার করি। দেখতে পাই যে, সবচে বিদ্যমান পাতলা পায়খানা হলো অজীর্ণ, আর সবচে কম ঘটে যাওয়া পাতলা পায়খানাকে স্থানীয়রা বলে ডায়রিয়া বা কলেরা। সর্বমোট পাতলা পায়খানার মধ্যে মাত্র আট থেকে দশ ভাগ হলো এই শেষোক্ত ধরনের। নিবিড় আলোচনা ও তথ্য সংযোগের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, স্যালাইনের কম ব্যবহারের অন্যতম কারণ হলো ওটেপ সবেমাত্র প্রাপ্ত 'চার-ডায়রিয়া' তত্ত্ব গ্রামাঞ্চলে স্যালাইন শিক্ষায় কাজে লাগাচ্ছিল না। ওটেপ কর্মীরা যখন কোনো মা-কে শিক্ষা দিত, তখন তারা বলত আপনার সন্তানের যদি ডায়রিয়া হয়, তাহলে এই স্যালাইন ব্যবহার করবেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে মায়েরা ডায়রিয়া বলতে বিশেষ এক ধরনের পাতলা পায়খানা বুঝে থাকেন, যার হার দশ ভাগেরও কম। ওটেপ কর্মীদের কথা শুনে মায়েরা তাদের সন্তানদের স্যালাইন প্রয়োগ করছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা শুধু বিশেষ এক প্রকার পাতলা পায়খানার ক্ষেত্রে, যাকে মায়েরা বলতেন ডায়রিয়া। এর ফলে দেখা গেল যে, যদিও স্যালাইন ব্যবহারের গড় হার কম কিন্তু ডায়রিয়া নামক বিশেষ পাতলা পায়খানার জন্য এর ব্যবহার অনেক বেশি। আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, যেহেতু গ্রামাঞ্চলে চার ধরনের পাতলা পায়খানা সবই মূলত ডায়রিয়া এবং সবগুলোর ক্ষেত্রেই শরীর থেকে তরল পদার্থ বেরিয়ে যায়, সেহেতু শিশুমৃত্যু রোধে সব ধরনের ডায়রিয়াতেই স্যালাইনের ব্যবহার বাড়াতে হবে। এটি ছিল ওটেপ-এর জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। ওটেপ সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বার্তা ও শিক্ষার ধরনে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। এতে করে ওটেপ কর্মীরা গ্রামে যাওয়ার পর প্রথমেই জেনে নিত ডায়রিয়ার স্থানীয় নানা নাম। তারপর মায়েদের শিক্ষা দেওয়ার সময় বলত 'আপনার শিশুর যদি দুধহাগা, অজীর্ণ, আমাশয় বা ডায়রিয়া হয় তাহলে খাবার স্যালাইন দেবেন'। দেশের অন্যত্র একই ধরনের গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

যদিও চার ধরনের পাতলা পায়খানার অস্তিত্ব সব জায়গায়ই রয়েছে, কিন্তু স্থানীয়ভাবে নামে পরিবর্তন ঘটে। যেমন: দাউদকান্দিতে যেটাকে বলে দুধহাগা, সিলেটে তাকে বলে বুনিহাগা, বরিশালে বাওবাতাস ইত্যাদি।

এই বিশেষ গবেষণা নিয়ে আরও কিছু স্মৃতি জাগরূক ঘটনা আছে। দাউদকান্দির কাজের ফাঁকে মাসে দু'বার ঢাকায় আসতাম। আমার এক দুলাভাই ছিলেন খুবই রসিক প্রকৃতির মানুষ। সাবেক সেনা কর্মকর্তা। হেসে হেসে একবার আমায় প্রশ্ন করলেন, তোমার পায়খানা গবেষণা কেমন চলছে? বললাম, আপনারা তো এক বা দুই ধরনের পায়খানা চেনেন। গ্রামের লোক কিন্তু চার ধরনের পায়খানার সঙ্গে পরিচিত। শুনে উপস্থিত সকলেই খুব মজা পেয়েছিল।

বাংলাদেশ সরকার প্রথমদিকে এক লিটার পানির উপযোগী প্যাকেট স্যালাইন তৈরি করত। ব্র্যাক যেহেতু আধা লিটারের কথা বলত তাই সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এখন আধা লিটারের প্যাকেট বাজারজাত করছে।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ওটেপ-এর এক বিশাল প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রথমদিকে এক লিটার পানির উপযোগী প্যাকেট স্যালাইন তৈরি করত। ব্র্যাক যেহেতু আধা লিটারের কথা বলত তাই সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এখন আধা লিটারের প্যাকেট বাজারজাত করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথমদিকে ব্র্যাকের এই কার্যক্রম সহজভাবে নেয়নি। একবার জেনেভা থেকে আগত এক কর্মকর্তা সরকারের কাছে গিয়ে ব্র্যাকের এই কর্মসূচি বন্ধ করতে বলেছিলেন। কিন্তু ব্র্যাক এ ব্যাপারে ছিল আপোষহীন, তাই ওদের ধর্না কাজে লাগেনি।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে নতুন এক ধরনের স্যালাইন নিয়ে আলোচনা বেশ জমে ওঠে। গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছিল যে গ্লুকোজের পরিবর্তে যদি চালের গুঁড়া ব্যবহার করা যায় তাহলে এই নতুন স্যালাইন ডায়রিয়ার প্রকোপ এবং স্থিতিকাল বেশ কমিয়ে আনতে পারে। আমরা নতুন এই স্যালাইনের বাংলাদেশে ব্যবহারের উপযোগিতা যাচাই করতে লেগে গেলাম। সহকর্মী ফজলুল করিমের নেতৃত্বে নোয়াখালীতে ছয় মাসব্যাপী একটি ফিল্ড ট্রায়াল চালানো হয়। এই নতুন স্যালাইন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নীতিমালা ঠিক করতে ১৯৮৬ সালে পাকিস্তানের করাচীর আগা খান ইউনিভার্সিটিতে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমরা সেখানে আমাদের গবেষণার ফলাফল তুলে ধরি। আমরা দেখিয়েছিলাম যে, যদিও নতুন উদ্ভাবনটির কিছু গুণ রয়েছে কিন্তু বিস্তীর্ণ গ্রামের মহিলারা এটি ব্যবহার করতে খুব উৎসাহী নন। নতুন স্যালাইন তৈরির বাড়তি ঝামেলাই এর প্রধান কারণ। চাল প্রথমে শিল-পাটাতে পিশে রান্না করতে হয়। তারপরই তা শিশুদের খাওয়ানো যায়। বেশির ভাগ ডায়রিয়াই রাতে হয়। তাই মায়েরা একে বাড়তি ঝামেলা বলে মনে করেন। আমাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল দেখে বিশ্ব সমাজ আর ওই পথে এগোয়নি।

ওটেপ-এ আরেকটি নতুন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওটেপ ছিল একটি আচরণগত সামাজিক আন্দোলন, কিন্তু এর মাধ্যমে একটি প্রযুক্তির প্রায়োগিক যোগাযোগ ঘটেছিল। আরেকটি দিক হলো এর ব্যাপ্তি। ওটেপ কর্মীরা সারাদেশব্যাপী প্রায় দেড় কোটি বাড়ির প্রতিটিতে গিয়েছে এবং হাতেকলমে স্যালাইন বানানো শিখিয়েছে। এ ধরনের প্রযুক্তিনির্ভর একটি কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্র্যাকের জন্য ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। প্রকল্পের বিশালতা বিবেচনা করে আবেদ ভাই ব্র্যাককে পরামর্শ দেওয়ার নিমিত্তে একটি আন্তর্জাতিক টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি কমিটি বা টেক গঠন করেন। এতে ডায়রিয়া ও গবেষণার কাজে অভিজ্ঞ বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অংশ নেন। প্রতি তিনমাস অন্তর-এর সভা হতো। কোনো সময় এটা হতো আবেদ ভাইয়ের মগবাজারের বাসায়, আবার কখনওবা মহাখালীর জাকারিয়া হোটেলে। একবার হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে। ব্র্যাকের পক্ষ থেকে সভায় আবেদ ভাই ও আমি উপস্থিত থাকতাম। আমি এই কমিটির সচিব হিসেবে কাজ করতাম। সম্যক পর্যালোচনার জন্য সদস্যরা মাঝে মাঝে মাঠ পর্যায়ে যেতেন। আমিও তাদের

সঙ্গে যেতাম। একবার একটি সভা চলছিল যেখানে আবেদ ভাই ওটেপকে দেশব্যাপী সম্প্রসারণে তার চিন্তা-ভাবনার কথা তুলে ধরেছিলেন। টেক এর সদস্য লিংকন চেনসহ বেশ কয়েকজন এই চিন্তাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু আবেদ ভাই নিজের লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। তাদের কথায় নিরুৎসাহিত না হয়ে তিনি সামনে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। এটি ছিল আবেদ ভাইয়ের চরিত্রের একটি অন্যতম শক্তিশালী দিক। টেক কমিটির কার্যক্রম থেকে আমার অনেক কিছুই শেখা হয়েছিল। আমাদের গবেষণা কাজ সম্পর্কে আমিও তাদের অবহিত করতাম যা তারা উৎসাহভরে শুনতেন, উপভোগ করতেন এবং সময়ে সময়ে প্রাসঙ্গিক পরামর্শও দিতেন। এই কমিটির সঙ্গে কাজ করে অনেক জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, যা আমার পরবর্তী জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমার এক সময়ের সহকর্মী ও সহযাত্রী টেক-এর সকল সদস্যের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রইল।

খাওয়ার স্যালাইন এখন বাংলাদেশে এক অতি পরিচিত নাম, ওটেপ পরিচালিত লবণ-গুড় কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে মুখে খাওয়ার স্যালাইন ব্যবহারের হার বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। শুধু তাই নয়। স্যালাইন এখন এ দেশের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগের একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, এ দেশের সন্তানেরা তাদের মায়েদের কাছ থেকে মুখে খাওয়ার স্যালাইন সম্পর্কে জানছে। এভাবে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবহমান এই জ্ঞান কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে।

ওটেপ তথা ব্র্যাককর্মীদের জন্য এটি হয়ে থাকবে পরিতৃপ্তির এক অবিস্মরণীয় উৎস।

কৃতজ্ঞতা : সুখেন্দ্র কুমার সরকার ও জালালউদ্দীন আহমেদ।

আমার ব্র্যাক জীবন